গণ্ডামারার মানুষের কথা

নাসরিন সিরাজ এ্যানি

৬ এপ্রিল তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি চট্টগ্রাম শাখার কয়েকজন গণ্ডামারা হত্যাকাণ্ড সরেজমিনে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। দলে প্রায় ১৩ জন বাম রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁদের মূলত গাইড করছিলেন বাঁশখালী উপজেলার একজন স্কুল শিক্ষক, যিনি নিজেও মার্কসবাদী এক দলের নেতা। আমিও এই দলে ছিলাম।

সাগরপাড়ের বেড়িবাঁধ আর খালের মাঝখানের চর এলাকা হলো এই গণ্ডামারা। লবণ, চিংড়ি আর ধানের চাষ হয় এখানে। জলকদর খালের ওপরের খাড়া ব্রিজটা পার হয়ে কয়েকটি ছোট চায়ের দোকানে নানা বয়সী কয়েকজন লোক ছিলেন। আমরা তাঁদের দেখে আমাদের মোটরবাহন থেকে নামলাম। লোকজন আমাদের চারপাশে জড়ো হয়ে হড়বড় করে সব বলতে থাকলেন। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা গ্রামের ভেতরে ঢুকতে থাকলাম। যমুনা টেলিভিশনের লাইভ চলছিল বলে একটু সামনেই আমরা একটা বড় জটলা পেলাম। পথে যেতে যেতে আমাকে যে ছেলেটি পাকড়াও করল তার বয়স ১৬-১৭ বছরের মতো। তার গালে ছ্যাঁচড়ানোর দাগ জ্বলজ্বল করছিল। তার গল্পটি নিম্নরূপ–

: (আমাদের একজন সঙ্গীর মোটরসাইকেল দেখিয়ে) তারা তো এইভাবে মোটরসাইকেলে করেই এসেছিল আর এ রকম হেলমেট পরে, যারা সেদিন আমাদের গুলি করেছিল। তাদের সাথে পুলিশ ছিল। এরা এস আলমের গুণ্ডা।

সাংবাদিকগুলো একটাও ঠিকঠাক খবর লেখে না। তিন-চারজন এর মধ্যে আসছে, আমাদের সাথে কথা বলছে; কিন্তু এস আলমের টাকা খেয়ে সব মিথ্যা লিখছে। গাড়ি ভাঙ্গার কথা তারা নিউজ করছে, কিন্তু এইটা বলে নাই যে আমরা এখানে (কয়লা) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই না।

প্রশ্ন : কিভাবে চিনলেন যে তারা এস আলমের গুণ্ডা?

: তারা পুলিশের পোশাক পরে এসেছিল, মুখে মুখোশ ছিল। কিন্তু আমরা এলাকার মানুষ, আমরা এস আলমের গুণ্ডাদের চিনি না? তারা তো এখানে প্রায় সময়ই আসে।

(তার পাশ থেকে একজন যোগ করেন) আসার সময় এস আলমের অফিসটা দেখেছেন না? সেখানে অন্তত দুই হাজারটা পুলিশের পোশাক আছে। এগুলা পরেই গুণ্ডারা এখানে আসছে। ওইখান থেকেই গাড়িতে ওঠে।

প্রথমজন: এখানে থানায় ২০-২৫ জন পুলিশ থাকে। কিন্তু আসছে অন্তত ২০০ জন।

(পাশ থেকে কয়েকজন মন্তব্য করে) ওসি, ইউএনও, এমপি সাহেব সব বেইচা গেছে (এস আলমের কাছে)।

চারপাশে সবাই একসাথে ঘটনার বর্ণনা করছে। আমরা কারা, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি–এসব জেরাও করছে। এরই মধ্যে একজনের বর্ণনা শুনে আমার গতকালের প্রথম দেখা আহত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি, এখানে একজন দোকানদার গুলি খাইছে না?'

সবাই একসাথে বলে, "হ, হ...এই যে তার দোকান...মদিনা...তার পায়ে (কাছ থেকে ধরে) গুলি করে এখান থেকে টানতে টানতে ওই ব্রিজের উপর তুলছে। পাকার উপর টানছে না, তাই অনেক ব্যথা পাইছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীও এত বর্বর ছিল না...মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এত অত্যাচার হয়নি..."

লক্ষ করলাম, আমরা এখনো মূল গোলাগুলির জায়গা স্কুল মাঠটি থেকে কিছুটা দূরেই অবস্থান করছি। এর মধ্যেই জাতীয় কমিটির কাফেলা তাদের সংহতি প্রকাশমূলক বক্তৃতা ও মিছিল সম্পন্ন করে।

তারপর কে যেন প্রস্তাব করেন, আমাদের আহতদের দেখতে যাওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে চট্টগ্রামের জাতীয় কমিটি এই ঘটনার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিল না। দ্রুত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই চলে আসা। কয়েক দিন হলো মাত্র তারা এই এলাকায় আসা-যাওয়া করছে। কাউকে ঠিকমতো চেনে না, তাই এখানে এসে কী করবে তেমন কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাদের ছিল না। উপস্থিত সকলে মিলে আমাদের নিয়ে গেল মরিয়ম আর কুলসুমের কাছে।

এখানে সকলে সম্মিলিতভাবে যে গল্পটি বলে তা হলো–

পুলিশ যে শুধু এলোপাতাড়ি গুলি করে কতকগুলো নিরীহ লোককে মেরেছে তা-ই নয়, উপরন্তু তারা ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের গুলি করেছে। কুলসুম তো তাঁর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন আর মরিয়ম জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলেন বাইরে কী হচ্ছে, যখন তাঁদের ঘরে ঢুকে গুলি করা হয়। আহতদের নিয়ে প্রধান সমস্যা হলো তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। ৩০০০ অজ্ঞাত লোকের নামে মামলা হয়েছে–এই ভিত্তিতে হাসপাতালে গেলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। এই গ্রেপ্তারের ভয়ে লোকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে যেতে পারছে না বা গেলেও নিজেদের নাম-ঠিকানা গোপন রাখছে।

মরিয়ম তাঁর গুলিতে আহত হাত দেখান। তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে। চোখ ছলছল। তিনি আমাকে বলেন, 'কুলসুম চার মাসের গর্ভবতী। আর পাঁচটা বাচ্চা তার জীবিত। সবগুলা ছোট ছোট। কে তাদের দেখে! মা ছাড়া বাচ্চাগুলা।'

তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য মহিলারা মিলে আমাকে কুলসুমের পরিবারের একটি ছবি সাজিয়ে দেয়।

কুলসুমের স্বামীকে জিজ্ঞেস করি–কী অবস্থা আপনার রোগীর?

: গ্রেপ্তারের ভয়ে আমি হাসপাতালে যাইনি। রাস্তায় (গ্রাম থেকে বেরোনোর রাস্তায়) বের হলেই তো পুলিশ ধরবে...। ওনার (কুলসুমের) ভাই আছে এখন সাথে। তারাই দেখভাল করছে।

উল্লেখ্য, এঁরা সাবই দিনমজুর। হয় কৃষিকাজ, না হয় লবণ চাষ, না হয় সাগরে মাছ ধরা–এই কাজগুলো তাঁরা করে থাকেন।

অনেকে জাতীয় কমিটির সদস্যদের ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে কোথায় কী অবস্থায় গুলি হয়েছে সেগুলো দেখায়। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে এরপর যাওয়া হয় স্কুল মাঠটির দিকে, যেটি মূল গোলাগুলির ঘটনাস্থল। আমি মিছিল না করে চুপচাপ হাঁটতেই থাকি। আমার সাথে আলাপে যোগ দেন কুলসুমের স্বামী, সাথে আরো পাঁচ-ছয়জন লোক।

আমার প্রশ্ন : মারামারিটা লাগল কেন? এখানে হইছেটা কী?

আবারও আমাকে বোম্বার্ট করা হলো একগাদা উত্তরে। আমি সংক্ষেপে লিখছি আমি যা বুঝেছি সেগুলো।

: ৩ তারিখ (রাত ১২টার পর কিন্তু নতুন তারিখ, বুঝিয়ে দেয় একজন) ভোররাতে পুলিশ এসে কতকগুলো মানুষকে গ্রেপ্তার করে। তারা বেড়িবাঁধের ওপর ঘুমাচ্ছিল। সে কারণেই আমরা (লিয়াকত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে) প্রতিবাদ সমাবেশ ডেকেছিলাম আর পুলিশ এসে আমাদের নির্বিচারে গুলি করে।

প্রশ্ন : কিন্তু পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল কেন?

: কে বা কারা বিদ্যুৎ প্রজেক্টের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। সাংবাদিকগুলো একটাও ঠিকঠাক খবর লেখে না। তিন-চারজন এর মধ্যে আসছে, আমাদের সাথে কথা বলছে; কিন্তু এস আলমের টাকা খেয়ে সব মিথ্যা লিখছে। গাড়ি ভাঙ্গার কথা তারা নিউজ করছে, কিন্তু এইটা বলে নাই যে আমরা এখানে (কয়লা) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই না।

প্রশ্ন: কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইলে আপনাদের অসুবিধা কী?

: আরে কয়লা পোড়াইলে তো অনেক ক্ষতি। সুন্দরবনে একটা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র করতেছে না? সেইটা হইলে গাছ মরে যাবে, বাঘ মরে যাবে; কিচ্ছু থাকবে না। সেই রকম অবস্থা এখানেও হবে। আমাদের গাছপালা থাকবে না, কৃষি থাকবে না। আমাদের চলে যাইতে হবে। আমাদের বাপ-মায়ের কবর এখানে, ভিটা এখানে। আমরা কই যাব? কেন যাব? তুই (এস আলম) এখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে তো পারবি না, ঢুকতেই পারবি না। এই নিয়া তো অনেক দিন ধরে গণ্ডগোল চলতেছে। বেশি হইতেছে এই গত দুই-তিন মাস হইল।

: (পাশের থেকে একজন) তুই আপারে কিছুই বুঝাইতে পারতাছোস না। শোনেন আপা, সব গণ্ডগোল হইল ভাগের টাকার কারণে। সেদিনও তো এমপি সাহেবের বাসায় এই নিয়া দুই পক্ষে মারামারি হইছে। মাঝখান দিয়া এই নিরীহ মানুষগুলা মরল। আমি আজকে ৩৮ বছর আওয়ামী লীগ করি। এই যে এমপি হইছে, এরে তো আওয়ামী লীগের কেউ চিনেই না। এরা (এমপি সাহেব) শুধু টাকা চিনে...

কথা ঘুরে যায়। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাস্তার আশপাশের দেয়ালে, টিনে গুলির দাগ দেখাতে। বোঝা যায়, এখানে এলোপাতাড়ি গুলি করা হয়েছে।

আমার মাথায় প্রশ্ন আসে, পুলিশ কি খুব আতঙ্কে ছিল যে তাদের গ্রামবাসী আক্রমণ করবে? না হলে এভাবে এলোপাতাড়ি গুলি কেন? কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই আমরা স্কুল মাঠে পৌঁছে যাই। জাতীয় কমিটি এরই মধ্যে একটি তাৎক্ষণিক সমাবেশ শুরু করে দিয়েছে মাঠটিতে। আমাকে লোকজন দেখাতে থাকে গুলি আর রক্তের দাগ–এই যে দেখেন, এদিকে আসেন...মর্তুজ নানা এই রুটিটা খাইতেছিলেন আমার দোকানে বসে। উনি এই রুটি শেষ করতে পারেন নাই। ওনার বুকে বন্দুক ঠেকায়া গুলি করছে।

আবারও আমি লোকজনের নানা দিক থেকে বলা গল্পগুলো শুনতে থাকি। বুঝতে চেষ্টা করি, কেন পুলিশ আক্রমণ করেছে, কতজন পুলিশ ছিল, কত রাউন্ড গুলি পুলিশ এখানে ব্যবহার করেছে পাবলিককে আক্রমণ করতে।

গল্পগুলোর ধারাবাহিকতা লক্ষ করে বোঝা যায় যে পাবলিক দাবি করছে তারা ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে সে সম্পর্কে জানত না। পুলিশের অ্যাকশন তাই তাদের আচমকা লেগেছে। পাবলিকের ভাষ্য মোটামুটি এ রকম : আমরা তো কোনো অস্ত্র (বল্লম, টেঁটা ও লাঠি এই অঞ্চলে ঘরে ঘরেই থাকে) নিয়েই যাইনি। মিটিং হবে শুনেছি, মিটিং শুনতে গেছি। আমরা যদি প্রস্তুত হয়ে যেতাম তাহলে একটা পুলিশও সেদিন জান নিয়ে এখান থেকে পালাতে পারত না।

আবারও আমাকে অভিযোগ করা হয় যে ৪ এপ্রিলের আক্রমণে পুলিশ ও আনসারের পোশাকে এখানে এস আলমের গুণ্ডাবাহিনী গুলি করেছে। আমার সামনেই সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করলেন আসলে কতজন পুলিশ সেদিন আসল পুলিশ ছিল। মোট ২০০ জন পুলিশ, এর মধ্যে কেউ বললেন ৫০ জন, কেউ বললেন ৭০ জন আসল পুলিশ ছিল আর বাকিরা ছিল এস আলমের গুণ্ডা। প্রথমে তারা আকাশের দিকে গুলি করে, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে তারা। মোট ১০০০ রাউন্ড গুলি চলে সেদিন, বলেন এই প্রত্যক্ষদর্শীরা।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে পুলিশের পোশাক এস আলমের গুণ্ডারা গায়ে চড়িয়েছে। প্রশ্ন করি আবার, কিভাবে চিনলেন এস আলমের গুণ্ডা তারা?

আবার সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করল–

: ওদের পরনে মুখোশ ছিল (কারণ তারা কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছিল অ্যাকশনের সময়)...মর্তুজ আর অঙ্কুরকে তো ওরা গুলি করেছে কাছে থেকে, কারণ ওরা তাদের চিনে ফেলেছিল, মুখোশ টেনে খুলে ফেলেছিল...

: আর আমরা তো স্থানীয়, আমরা তাদের চিনি–এস আলমের অফিস থেকেই তারা গাড়িতে উঠেছে (একই কথা আমি আরেকজনের কাছেও শুনেছিলাম একটু আগে)...ওইখান থেকেই তারা গাড়িতে ওঠে, ওইখানেই থাকে।

: ধুর...ঐগুলা পুলিশই...ইউএনও, ওসি–সব ছিল... (বেআইনিভাবে তাই পুলিশের পোশাক, পুলিশ নয়–এমন কেউ পরতে পারে না)

আমি বলি, তাহলে হয়তো এরা পুলিশই...

: এরা (পুলিশ ও স্থানীয় প্রসাশন) মাফিয়া ডনদের (এস আলম) হয়ে কাজ করছে। এস আলমের টাকা খেয়ে পুলিশ গুলি

আমাদের বাপ-ভাই-স্বামী পুলিশের ভয়ে রাতে ঘরে ঘুমাতে পারে না, বিলে বিলে ঘুমায়। আর পুলিশের পোশাক পরে আসামি ধরার নাম করে এরা ঘরে ঢুকছে , আমাদের অলংকার, মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। আমরা ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারি না।

করেছে...

বাংলাদেশের মানুষের পুলিশ প্রশাসনের ওপর অনাস্থা, অবিশ্বাস, ক্রোধ, ক্ষোভ আমি যে এই প্রথমবার লক্ষ করেছি তা নয়। ফুলবাড়ী কয়লাখনি বিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে গবেষণাকাজ করতে গিয়েও আমি দেখেছি, পুলিশ, প্রশাসন, সরকার নিয়ে তাদের এ রকমই ভয়াবহ সব অভিযোগ।

জাতীয় কমিটি এর মধ্যে তাদের তাৎক্ষণিক সমাবেশ শেষ করে ফেলে আমাকে ডাকতে থাকে। লিয়াকত চেয়ারম্যান এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় জাতীয় কমিটি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে চাইল না। তারা বরং আগ্রহী নিহতদের আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে, তাই আমরা সেটাই করলাম।

আইনের লোককে অনেক সম্মান দেখানো হইছে। আর না।

এই ফাঁকে বলে নিই, যদিও জায়গাটির নাম গণ্ডামারা লিখছে সবাই, কিন্তু এলাকাবাসীর সাথে আলাপ করে আমার মনে হলো, জায়গাটার নাম আসলে গণ্ডারমারা হওয়া উচিত ছিল। হয়তো সেটাই ছিল এর আসল নাম, পরে মুখে মুখে হারিয়ে গেছে গণ্ডার-এর 'র'। এলাকার নামকরণ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে এলাকাবাসী জানায়, একসময় এই এলাকা জঙ্গল (চকোরিয়া সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের অংশ) ছিল এবং জনবসতি স্থাপন করতে এখানে অনেক গণ্ডার মারা পড়েছিল সেই মগ রাজাদের (আরাকান শাসনামল) সময়। সেই থেকেই এ নাম।

নিহতদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে করতে আমাদের মোটরবাহন চলতে থাকে এবং একটা জায়গায় এলাকাবাসীর অনুরোধে তাদের কথা শুনতে আমাদের থামতে হয়। আমাদের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও উপস্থিত ছিলেন। আমি নারীদের দিকে এগোতেই আবার সবার একসাথে পুলিশ ও কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে ক্ষোভ, ক্রোধ ও আপত্তি জানানো শুরু হয়–

: আমার দুই মামা মারা গেছে, মামাতো বোনের স্বামী মারা গেছে। আমাকেও মেরে ফেলুক, তবু আমরা কয়লাবিদ্যুৎ চাই না। আমাদের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো অত্যাচার করতেছে। আমাদের বাপ-ভাই-স্বামী পুলিশের ভয়ে রাতে ঘরে ঘুমাতে পারে না, বিলে বিলে ঘুমায়। আর পুলিশের পোশাক পরে আসামি ধরার নাম করে এরা ঘরে ঢুকছে , আমাদের অলংকার, মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। আমরা ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারি না।

এ সময় আমি উপলব্ধি করি যে একই পরিবারের তিনজন মারা গেছেন একসাথে। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম, মৃত আনোয়ারুল ইসলাম ও মর্তুজ আলী ছিলেন আপন দুই ভাই আর জাকির হোসেন ছিলেন মর্তুজ আলীর মেয়েজামাই। আর্দ্র চোখ নিয়ে মেয়েরা আমাকে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল আর আমি ভাবছিলাম, এক পরিবারে এতগুলো মৃত্যু কিভাবে শোক সামলাচ্ছে এই মানুষগুলো! প্রশাসন, সরকার, ব্যবসায়ীরা এদের দেখছে জঞ্জাল হিসেবে, উন্নয়নের বাধা হিসেবে...আমরা দেখছি প্রতিবাদকারী হিসেবে, কিন্তু আমরা এঁদের মানুষ ভাবছি তো? আমার বাবা, ভাই, মামা, চাচা, দাদা, স্বামী, ছেলে পুলিশের গুলিতে না মরে স্বাভাবিকভাবে মরলেও কি আমার সমান শোক হবে না, এখন ওনাদের যেমন হচ্ছে...শেষ পর্যন্ত তো আমরা মানুষই–সবাই এক, শোকের অনুভূতিও আমাদের সমান...

মৃত আনোয়ারুল ইসলাম, মর্তুজ আলী আর জাকির হোসেনের বাড়ি গিয়ে জাতীয় কমিটির নেতারা পুরুষদের সাথে আলাপে বসেন। আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায় বাড়ির মেয়েরা। কান্নাকাটি-আহাজারির রোলের মধ্যেই বাড়ির বড় বউটি আমার পরিবার, লেখাপড়া, স্বামী-সন্তান সকলের খবরাখবর জেনে নেন, মাশাল্লাহ বলেন, আপ্যায়ন করেন শরবত, বিস্কুট আর কমলা দিয়ে। আমার পানির বোতল খালি হয়ে গেছে খেয়াল করে পানি ভরে দেয় বাড়ির এক কিশোরী। এর মধ্যেই আমাকে জানানো হয়, আনোয়ারের ছেলে আরাফাত বাপকে বাঁচাতে গিয়ে ছররা গুলতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমরা চলে গেলে ওর চাচু ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। এই বাচ্চা ছেলেটার মনের মধ্যে কী চলছে, কিভাবে এই শোক সামলাচ্ছে সে, ভাবতে গিয়ে আমার বোনের মেয়েটার কথা মনে হয়। বাবা বাবা করে তার কত আহ্লাদ, কত বায়না...

গণ্ডামারায় এস আলম গ্রুপ এরই মধ্যে ১৭০০ কানি জায়গা কিনেছে (জমির হিসাবে আমি কাঁচা, তাই অ্যাক্যুরেসিতে যাচ্ছি না)। ঝামেলাটা জমি কেনাবেচা নিয়ে নয়–বারবার পরিষ্কার করেন আমাকে উত্তরদাতারা। কারণ প্রজেক্টের জন্য এস আলমের জমি কেনা শেষ। টাকা-পয়সাও যারা জমি বেচেছে তারা পেয়ে গেছে। এখন যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তারা জমিদার লোক নয়, খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের কথা সামান্যই–কয়লা বিষক্রিয়ায় যে মাটি, পানি, গাছপালার ক্ষতি হবে, তাতে তো এই এলাকায় আর বসবাস করা যাবে না। কিন্তু তারা কোথায় যাবে? কী করে খাবে? দুইটা রথ (শরীরের কর্মক্ষমতা) ছাড়া তো তাদের সম্বল আর কিছু নাই।

আর আমার দাবিও সামান্যই–১. এই যে এলাকাবাসী দাবি করছে পুলিশ নিরীহ লোকদের আক্রমণ করেছে, তার তদন্ত হওয়া দরকার, দোষীদের শাস্তি হওয়া দরকার। ২. পুলিশের পোশাকে কি আসলেই গুণ্ডারা এসেছিল? প্রশাসন কি আসলেই এস আলমের প্রাইভেট বাহিনীর মতো কাজ করছে? তদন্ত চাই আমি এর। নাগরিক হিসেবে পাবলিক সারভেন্টদের এইসব ক্রিমিনাল কাজকারবারের তদন্ত ও শাস্তি চাই। ৩. অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে এই যে গ্রামবাসীদের ধরপাকড়-হয়রানি করা হচ্ছে, এইসব হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

শেষ করব এক নিহতের ছেলের উক্তি দিয়ে। জাতীয় কমিটির নেতারা তাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়ার, শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি উত্তর করেন–

: ওনাকে মেডিক্যালে নিলে বাঁচানো যেত। পুলিশ নিতে দেয় নাই। আইনের লোককে অনেক সম্মান দেখানো হইছে। আর না।

নাসরিন সিরাজ এ্যানি : নৃবিজ্ঞানী
ই-মেইল : nasrinsiraj@yahoo.com

(thotkata.net এ পূর্বে প্রকাশিত)